কথাশিল্পী কমলকুমার : স্রষ্টা ও সৃষ্টি

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ. ডি. (কলা) উপাধির জন্য
উপস্থাপিত গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

সুশীল আগরওয়ালা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
মেদিনীপুর

২০১১

সূচিপত্র

- ভূমিকা ১
- প্রথম অধ্যায় • কমলকুমার: স্রষ্টার জীবন ৪
- দ্বিতীয় অধ্যায় • উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ৩২
- তৃতীয় অধ্যায় • ইতিহাসবোধ, মিথ-পুরাণ ও রাজনৈতিক চেতনা ৪৯
- চতুর্থ অধ্যায় • গল্প-উপন্যাসে আদিবাসী ও অন্ত্যজ জীবন ৬৩
- পঞ্চম অধ্যায় • গল্প-উপন্যাসের গঠনরূপ ৭৯
- ষষ্ঠ অধ্যায় • চরিত্র বিশ্লেষণ ৯৬
- সপ্তম অধ্যায় • গদ্যশৈলী ১২২
- অষ্টম অধ্যায় • কমলকুমারের সাহিত্যে ধর্ম ও অধ্যাত্মভাবনা ১৪৪
- নবম অধ্যায় • অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা ১৬৭
- উপসংহার ১৯২
- সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ২০১
- কমলকুমার মজুমদার • গ্রন্থপঞ্জি ২০৫

প্রথম অধ্যায়: কমলকুমার : স্রষ্টার জীবন:

কমলকুমার মজুমদারের জন্ম হয় ১৯১৪ সালের ১৭ই নভেম্বর, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মায়ের নাম রেণুকাময়ী, বাবা প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁরা চার ভাই (কমলকুমার, নীরদ, অমিয় ও চিত্তরঞ্জন), তিনবোন (বানী, গীতা ও শানু)। কমলকুমার সকলের বড়।

কমলকুমার, নীরদ, বাণী মজুমদার আর শানু লাহিড়ী-এই চার কৃতি ভাই বোনকে নিয়ে বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম নক্ষত্রখচিত পরিবার তাঁদের।

কমলকুমারের মতো স্রষ্টার জীবন সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর পারিবারিক জীবন জানা খুব জরুরি। তাঁর বাবা-মা উভয়েই ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করা হত। তখন কোথাও এভাবে ২৫ শে বৈশাখ পালন করা হত না। বুঝুক না বুঝুক, মা সেই বয়সেই ছেলেমেয়েদের পড়ে শোনাতেন শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য। কিছু বড় হলে মা তাদের নিয়ে যেতেন যাত্রা, নাটক দেখাতে। চিত্র প্রদর্শনীতেও যেতেন। ছেলেমেয়েদের কল্পনা-শক্তির বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে মা'র ভূমিকাই ছিল প্রধান। কলকাতা পুলিশের অফিসার বাবা ছিলেন প্রকৃতিতে স্বচ্ছ অথচ মানসিকতায় দৃঢ়।

মাঝেমধ্যে তাঁরা বৈদ্যনাথ ধাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে রিখিয়ার এসে থাকতেন। সেখানে ছিল বাবার কেনা বাড়ি। রিখিয়ার প্রকৃতি পরিবারের সকলের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত। সেখানে তাঁদের নিয়মিত যাতায়াত।

ছেলেবেলায় কমলকুমার আর নীরদ বেশ কিছুদিন টোলে গিয়ে সংস্কৃত পড়েছিলেন। তাঁরা তখন কলকাতার ব্লকমন স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন। সেই বাড়িতে আসতেন সাহিত্যিক অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী আর সরলা দেবী।

কমলকুমার-নীরদ তখন ক্যাথিড্রাল মিশন স্কুলে ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছেন। তখন থেকেই দু ভাইয়ের প্রথাগত লেখাপড়ার চেয়ে মন বেশি শিল্পচর্চায়। সারাক্ষণ নানাধরণের বই পড়তেন। প্রথাগত পড়াশোনা যেটুকু স্কুলে জোর করে করা। পরে বাবা দুই ছেলেকে ওখান থেকে ছাড়িয়ে ২৪ পরগনার বিষ্টুপুর 'শিক্ষাসংঘ' আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। কমলকুমার ভাল অভিনয় করতেন। বিষ্টুপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকাকালীন নিয়মিত নাটকে অংশ নিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক রেভারেণ্ড সুধীর চ্যাটার্জীর প্রভাব তাঁর জীবনে গভীর। খ্রিষ্টধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কমলকুমার প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করেছিলেন তাঁর সান্নিধ্যে এসে।

১৯৩৪ সালের ৫ই জানুয়ারি বিহারের মুঙ্গেরে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। কমলকুমার তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে দুর্গতদের সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে চলে যান লখনউ-মুলতানে। এক বছর ছিলেন লখনউ এ মামার বাড়িতে। কিছুদিন পর রাজশাহীর খেতরিতে মেলা দেখতে যান। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের সঙ্গে মেলামেশা করেন।

এক পয়লা বৈশাখে অভিনীত হয় তাঁর লেখা নাটক ‘ছন্দপতন’। অভিনয় করেন কমলকুমার নিজে, নীরদ, তাঁদের দুইবোন আর বন্ধুরা। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় রসা রোডের মেডিকেল স্কুলে। তাঁর লেখা অন্য নাটক ‘হৃদিস্পুক’ মঞ্চস্থ হয় এক মোটর গ্যারেজে। তাঁর হাসির নাটক ‘প্রেমপত্রের অফিস’। কিছুদিন পর অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় লেখাগুলি তিনি ফেলে দেন।

তাঁর অভ্যাস ছিল বুকের তলায় বালিশ রেখে সারাদিন লেখাপড়া করা। রসারোডের বাড়িতেই তাঁর সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা ‘উষ্ণীষ’ বের হয়। ‘উষ্ণীষ’ মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৪৪ (১৯৩৭)। মোট তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এতে প্রকাশ পেয়েছে কমলকুমারের আদিপর্বের তিনটি গল্প— লালজুতো, প্রিনসেস আর মধু। বধূ নামে তাঁর একটি কবিতাও বেরিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে ফরাসি ভাষা শিখেছেন। এজন্য মা কমলকুমার-নীরদকে পাঠান বাবার চেনা এক ফরাসি সাহেবের কাছে। পরে কমলকুমার কেককী দে সরকারের খোঁজ পান। এই ফরাসি মহিলা বাংলায় সাবলীল। তাঁর কাছে তিন ভাই বোন একসঙ্গে ফরাসি শিখতে আরম্ভ করেন।

১৯৩৭ এ নাচের জন্য বোন বাণীর নাচের জন্য ইউরোপ যাত্রার প্রস্তাব এল। বাণীর সঙ্গে কমলকুমারের ও বিদেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ এসেছিল। নানা কারণে যাওয়া হয়নি।

১৯৩৮-৩৯ এ দুই ভাই মিলে ‘উল্কা’ নামে একটি ক্লাব গড়ে তোলেন। বাসাবদলে তাঁরা গিয়েছিলেন সীতারাম মোড়ে। এখানে দুভাই নিজের নিজের ঘর বেছে নিয়ে লেখাপড়া, ছবি আঁকার কাজ শুরু করেন। ১৯৩৯-৪০এ দু ভাই মিলে বাড়িতে নাচ-গান, ছবি আঁকার স্কুল শুরু করেন। ১৯৪৪-৪৫ থেকে কমলকুমারের কবিতা-নাটক লেখা কমে গেল। তখন নিয়মিত ছবি আঁকছেন। ১৯৪৩-৪৪ থেকেই তাঁদের অর্থের টানাটানি চলছিল। কাজের আশায় কমলকুমারকে ‘তাঁর স্বর্গরাজ্য’ রিখিয়া ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। যুদ্ধের ঠিক পরেই তিনি ব্যবসা শুরু করেন। তার তখন ভাল রোজগার। কমলকুমার জমানো ব্যবসা ছেড়ে হঠাৎ মাছের ভেড়ি নিয়ে মেতে ওঠেন। তিনি একসময় ‘দুর্নাম’ নামে ছোটদের বই লিখেছিলেন, বইটি ছাপাও হয়েছিল। ১৯৪৬ এর ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে দু’ভাই দুর্গতদের নানাভাবে সাহায্য করেন।

সত্যজিৎ রায় তখন থাকতেন তাঁদের বাড়ির উল্টো দিকে। তিনি মাঝে মাঝে কমলকুমারের বাড়িতে আড্ডায় যোগ দিতে আসতেন। কমলকুমার ও তাঁর বাড়িতে যেতেন। তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত প্রধানত শিল্পকলা নিয়ে।

রিখিয়ায় থাকাকালীন ১৩৪৩এর গোড়ার দিকে কমলকুমারের সঙ্গে আলাপ হয় কলকাতার মেয়ে দয়াময়ীর সঙ্গে। ধীরে ধীরে দুজনায় গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একসময় ব্যবসা ভাল চললেও তাতে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে কমলকুমার লেখালেখি, ছবি আঁকার সময় তেমন পেতেন না। অথচ শিল্প-সাহিত্যিক হওয়াই তাঁর জীবনের লক্ষ্য তাই ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। দয়াময়ীর সঙ্গে

বিয়ের পর কার্যত পরিবার থেকে দূরে সরে গেলেন।

১৯৪৮এ ফরাসি চলচ্চিত্র পরিচালক জাঁ রেনোয়া কলকাতায় আসেন ‘দ্য রিভার’ ছবির শ্যুটিং করতে। কমলকুমার ও সত্যজিৎ এই শ্যুটিং থেকে সিনেমা তৈরির অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৪৯ এর শেষ দিকে কমলকুমার সিগনেট প্রেস প্রকাশনার শিল্প উপদেষ্টার কাজ নেন। সেই সঙ্গে শুরু করেন গৃহ-শিক্ষকতা। পরে কাজ নেন জনগননা দপ্তরে। এখানে কাজ করার সুবাদে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন।

১৯৫০ সালে কমলকুমার, সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত ও সুভাষ রায়ের যৌথ সম্পাদনায় ‘চলচ্চিত্র’ পত্রিকা বের হয়। ১৯৫২ তে ‘তদন্ত’ নামে একটি অপরাধ বিষয়ক পত্রিকা বের করেন। এরপর তিনি গ্রামীণ শিল্প ও কারিগরী বিভাগে কাজ নেন। কিছুদিন কাজ করেন ললিতকলা অকাদেমির কলকাতা দপ্তরে। ১৯৫৪-৫৫ এ তিনি সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিল্প শিক্ষকের কাজ নেন। হরবোলা নামে একটি নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুকুমার রায়ের লক্ষণের শক্তিশেল, ‘মুক্তধারা’ পরিচালনা করেন।

১৯৫৭-৫৮ এ ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ গল্প ‘মতিলাল পাদরী’ ও ‘তাহাদের কথা’ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ তে ‘নহবৎ পত্রিকা’য় প্রকাশিত হয় ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ উপন্যাস। ১৯৬৩ তে গল্প সংগ্রহ’ নিম অন্নপূর্ণা আর ছড়া ছবির সংকলন। আইকম বাইকম প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সালের শেষ দিকে 'Arts and Crafts' নামে একটি বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা করেন। ১৯৭৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়।

সূত্রনির্দেশ :

১. লাহিড়ী, শানু স্মৃতির কোলাজ, পৃ. ১৪, ৩৯, ৯০

২. বসু পার্থ, সত্যজিৎ রায়, পৃ. ৯৮

৩. রুদ্র সুব্রত (সম্পাদক) কমলকুমার : রচনা ও স্মৃতি, পৃ. ১৪৯, ১৬৬

৪. পত্রী পূর্ণেন্দু, কিছু মানুষ কিছু বই, পৃ. ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ :

কমলকুমার মাত্র আটটি উপন্যাস লিখলেও তার সমস্ত উপন্যাসের বিষয়বস্তু, স্থান-কালের প্রেক্ষাপট একরকম নয়।

শবরীমঙ্গল : লেখকের মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেলেও এটিই তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তের আরণ্য-প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটির কাহিনী। নাম 'শর্বরীমঙ্গল' হলেও এটি শবর সম্প্রদায় নয়, সাঁওতাল-মুণ্ডা-ওঁরাও জনগোষ্ঠীর গল্প। রোমনি নামে এক আদিবাসী নারীর জন্য মাধালি নামের এক আদিবাসী খ্রীষ্টান যুবকের দুর্বার গোপন প্রেম এবং তাতে অস্থির নায়কের আত্মরক্ষার জন্য ভগবান দর্শনের ব্যর্থ উন্মাদনা এর মূল বিষয়। এর পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে কুষ্ঠাক্রান্ত অদ্বৈত মিশ্র, কোলিয়ারির আড়কাঠি সুবাই, মহাজন মাকড়া, মাধালির বোন লুহানী প্রভৃতি আন্তঃ সম্পর্কীয় জটিলতা। খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের জীবনযাপনের বিস্তারিত ছবি আছে এখানে।

অন্তর্জলী যাত্রা : সনাতন সংস্কারের নিগড় অসহায় যশোবতীর আশ্চর্য রূপান্তর ঘটায়, সে হয়ে ওঠে ট্রাজিক চরিত্রের নারী। তার একদিকে চণ্ডালের আকুল মিনতি সে যেন সতী না হয়ে সমস্ত সংস্কার বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে বাঁচে। অপরদিকে, মরণাপন্ন স্বামী তার মুখ চেয়ে জীবনমুখী। সে বেছে নেয় সতীত্ব কিন্তু ট্রাজিক নিয়তির মতো দুর্বার জোয়ারে দু জনেরই অন্তর্জলী যাত্রা শেষ হয়। উপন্যাসটিতে অতীতের পটভূমি - সতীদাহ প্রথা ও তৎকালীন হিন্দু সমাজকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সুহাসিনীর পমেটম : গ্রামের পটভূমিতে কিছু নিম্নমধ্যবিত্ত চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত। লেখক দেখিয়েছেন জীবনের অপ্রাপ্তি, অপূর্ণতার মাঝেও মানুষের অন্তরের সৌন্দর্যতৃষ্ণা নষ্ট হয় না। সেইসঙ্গে লোকাচার, সংস্কার গ্রামজীবনকে কতখানি ঘিরে থাকে - সেটিও এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।

শ্যাম- নৌকা : ব্রাহ্মণ সন্তান কালাচাঁদ মৃত্যু এবং সৌন্দর্যের দ্বৈরথে পথহারা। ধর্মীয় বিশ্বাসে আনুগত্য প্রকাশ করলেও বিরূপ পরিবেশ থেকে সে মুক্তি পায়নি। যে চেয়েছিল মানসিক উত্তেজনার নিরসন। যা আদৌ ঘটে নি। বাস্তব ও স্বপ্নলোকের অভিযাত্রায় সে কষ্ট পেয়েছে। লেখক উপন্যাসটিতে জীবনের ঘনিষ্ঠতা দিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার গ্লানি বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন।

পিঞ্জরে বসিয়া শুক : বর্ণবিভাজিত হিন্দুসমাজে ধর্মের ভূমিকা লেখক এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেহ-আত্মার রূপকের আড়ালে লুকিয়ে আছে ডোমজাতির কিশোর-ভৃত্য সুঘরাই-এর গ্লানিবেদনার কাহিনী। ব্রাত্যজনের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ধর্মের খাঁচায় কীভাবে বন্দী হয়ে যায় এটি তারই গল্প।

খেলার প্রতিভা : আকালগ্রস্ত মানুষেরা চব্বিশ পরগণার আবাদ অঞ্চলের বাসিন্দা। আকালের

প্রচণ্ড কোপে তারা ঘর ছেড়ে অনির্দেশের পথে বেরিয়েছে, যদি একটু ফ্যানও জোটে। খিদের জ্বালায় ক্ষিপ্ত মানুষগুলি একমুঠো চালের জন্য মারামারি করে। পথে অনেকের মৃত্যু হয়। উপন্যাসটিতে ১৯৪৩এর আকালের তথ্যায়ন নয়, গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনতৃষ্ণা, ধর্মসংস্কার ও দেশাচারের দিকে লেখক বেশি মনোযোগ দিয়েছেন।

গোলাপ সুন্দরী : যক্ষ্মা থেকে সদ্য সেরে ওঠা বিলাস নামে এক যুবকের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাওয়ার সমস্যাকে কেন্দ্র করে ছোট উপন্যাসটি রচিত। ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী লেখক উপন্যাসটিকে বিয়োগান্তক করেন নি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত বিলাস খবর পায়, 'গোলাপ সুন্দরী' একটি পুত্র রেখে মরেছেন। উপন্যাসটিতে জীবনের অনিত্যতা, ক্ষণবাদী চেতনাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

অনিলা স্মরণে : কনভেন্টে থাকাকালীন হঠাৎ অনিলার পিতৃবিয়োগ হয়। সেই পিতৃশোক বালিকাকে প্রায় উন্মাদ করে তোলে। পিতৃস্মৃতি হয়ে ওঠে তার কাছে নিত্য জপমালার মতো। কনভেন্টের খ্রীষ্টীয় পরিবেশ ও ধর্মসংস্কারে সুকুমার মতি বালিকাটির মধ্যে পিতৃশোক যে অস্বাভাবিক আবেশ সৃষ্টি করে, সেই আবেশ যেন শুদ্ধ মানসতারই নামান্তর। অপরদিকে অনিলার মা লাবণ্যদেবী দ্রুত পুনর্বিবাহ করেন, তাতে সদ্য পতিহারা নারীর শোকের ছায়া থাকে না। পাপবোধে তাড়িত হয় তার মাতৃস্নেহ । বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর বিষাদপ্রতিমা বালিকা অনিলা ক্রমেই নিঃশেষিত হতে থাকে। এটি বস্তুত এক ভিন্ন ধরনের প্রেম ও প্রেমহীনতার কাহিনী।

তৃতীয় অধ্যায় : ইতিহাসবোধ, মিথ-পুরাণ ও রাজনৈতিকচেতনা :

'অন্তর্জলী যাত্রা', 'শ্যাম-নৌকা', 'খেলার প্রতিভা', রুক্মিণীকুমার, তাহাদের কথা ইত্যাদি উপন্যাস গল্পে লেখক বিষয়বস্তুর দাবিতে উনিশ-শতকের সামাজিক ইতিহাস, বিশ-শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস, ভারতীয় (হিন্দু) ও বিদেশী পুরাণ প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত, কোনও ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে তিনি একটিও গল্প-উপন্যাস লেখেননি, করেননি প্রচলিত অর্থে পুরাণের পুনর্নির্মাণ।

ইতিহাসমনস্কতা কমলকুমারের মধ্যে প্রবল। উনিশ শতকের পটভূমিতে বেশি না লিখলেও কমলকুমার সেই কালের ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। উনিশ-শতকের ধর্মনেতা, সাহিত্যিকদের সপ্রশংস উল্লেখ তাঁর অনেক রচনায় মেলে। তিনি লিখেছেন, 'যদি সত্যই আমার গড়িবার ক্ষমতা থাকিত ..... আমি ১৯ শতকে জন্মাইতাম।'... অতীতে প্রত্যাবর্তনই আমাদের মাধুর্য্য ও সুখ দিয়া থাকে, কারণ অতীতের যাহা কিছু সত্য যাহা কখনও নিছক বর্তমানতা নহে - যেহেতু আমাদের জীবনের সমগ্রতা তাহা বহন করে।' হয়তো সে কারণেই বলেছেন, 'ইতিহাস সংশোধন আমার ইচ্ছা নয়।'

অত্যধিক অতীতমুখিতার জন্যই তাঁর চোখে বর্তমান যুগের লক্ষণগুলি একান্ত নেতিবাচক। বলা যায়, রোমান্টিক ভাবনাই এই সাহিত্য স্রষ্টাকে ইতিহাসের কাছে নিয়ে গিয়েছে।

'অন্তর্জলী যাত্রা' সহ একাধিক রচনায় হিন্দু-পুরাণের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। বিদেশি পুরাণের প্রসঙ্গ তাঁর সাহিত্যে কম থাকলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। 'রুক্মিণী কুমার' সহ একাধিক গল্প-উপন্যাসে এসেছে স্বাধীনতা- সংগ্রামের প্রসঙ্গ। যদিও প্রচলিত রাজনীতি তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর ভাষায়, ''রাজনীতিকে একেবারে সহ্য করিতে পারি না।'' বাম-রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা গল্প-উপন্যাসে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সরাসরি বলেছেন, 'আমি ভীষণ রকম প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিতে বিশ্বাসী নই'।

সূত্রনির্দেশ :

১. মজুমদার কমলকুমার, প্রবন্ধ সংগ্রহ

২. মজুমদার কমলকুমার, অগ্রন্থিত কমলকুমার

চতুর্থ অধ্যায় : গল্প-উপন্যাসে আদিবাসী ও অন্ত্যজ জীবন :

‘শবরীমঙ্গল’, ‘পিঞ্জরে বসিয়া শুক’ প্রভৃতি উপন্যাস এবং ‘মতিলাল পাদরী’র মতো গল্পে লেখক আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা অঙ্কন করেছেন। জনজাতি সমাজের কৌম-স্মৃতি, বিভিন্ন কাল্ট ও রিচুয়াল, তাদের ব্যবহারিক জীবনের বৈচিত্র্য উদঘাটনেও কমলকুমার যথেষ্ট দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। বস্তুত, কমলকুমারের গল্প-উপন্যাসে দেশের অতি-সাধারণ মানুষের কথাই ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর কলমে গরিব, তথাকথিত ছোটজাতের মানুষ নিছক করুণা কিংবা বিপ্লবের উপাদান হিসেবে উপস্থিত নয়। তাদের আছে একধরনের নিম্নবর্গীয় চেতনা। তাই ডোম, বাগদি, ভূমিহীন চাষি তাঁর সাহিত্যে শোষিত, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ হয়েই থাকে নি। তাদের রীতিমতো মন আছে। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বাইরে থাকা কৌমের চেতনা, লোকশিল্প, প্রাত্যহিক আচার-আচরণে সজীব যে নিম্নবর্গীয় মন- লেখকের আগ্রহ সে দিকেই। নিম্নবর্গের চৈতন্যে উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির প্রভাব ও তিনি লক্ষ্য করেছেন। অন্ত্যজ মানুষের যৌনতা, আত্মমুক্তি ও সৌন্দর্যচেতনা এবং ক্ষুধাজনিত কারণে নি:সঙ্গতা তাঁর গল্প-উপন্যাসের পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ। নিম্নকোটি ও উচ্চকোটির ভাব-বিনিময়, সংঘাত ও সমন্বয়ের এই শিল্পিত বিবরণ শুরু হয়েছে ‘সুহাসিনীর পমেটম’ থেকে আর শেষ হয়েছে ‘খেলার প্রতিভা’য়। মাঝখানে ‘পিঞ্জরে বসিয়া শুক’ এ ডোম-সাঁওতালদের অবস্থানকে তিনি দেখেছেন সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের আলোয়। হিন্দু সমাজে নিম্নবর্গীয়দের মানবিক বিকাশ রুদ্ধ করে দেওয়ার মর্মস্পর্শী চিত্রণ মেলে এই উপন্যাসে। অন্তর্জলী যাত্রা’র নায়ক এক শ্মশান চণ্ডাল তার অবহেলিত, রিক্ত জীবনেও মানবিকতা, নৈতিকতাকে ধরে রাখে। নিজের মতো করে যে জীবনকে উপভোগ করে। ‘খেলায় প্রতিভা’য় নির্মাণ করেছেন ব্রাত্যজনের বিশ্বাস, সংস্কার এবং জীবনযাপন পদ্ধতির রূপরেখা। বলা যেতে পারে, আদিম-অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী অর্থাৎ নিম্নবর্গীয়দের নিয়ে প্রথাসিদ্ধ সহানুভূতিপূর্ণ গল্প-উপন্যাসের বাইরে তিনি তাদের মানুষের পূর্ণ মর্যাদায়, জীবন্তরূপে চিত্রিত করেছেন। কমলকুমার দেশকে খুঁজেছেন মুখ্যত প্রান্তিক সংস্কৃতির মধ্যে, তার মধ্যে দেখেছেন আবহমানকে।

সূত্র নির্দেশ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় রাঘব, কমলকুমার, কলকাতা : পিছুটানের ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায় : গল্প-উপন্যাসের গঠনরূপ :

কমলকুমারের উপন্যাসগুলিতে গঠনগত বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। নানা আকৃতি ও প্রকৃতির উপন্যাস লিখেছেন তিনি। উপন্যাসের প্লট গঠনেও লেখকের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর ছোটগল্পের গঠন-রীতির সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্যও লক্ষ্য করবার বিষয়। কমলকুমার বলেছেন, 'গল্পের একটা ঘটনা থাকে, কিন্তু ঘটনা ইজ নো গল্প'। আরও বলেছেন, ''ঘটনাপ্রবাহকে আমি গল্পের উপজীব্য বলিয়া ধরি না। ...আমাদের ধারণা গল্পের বহুত্বের নিজস্ব কাঠামো আছে এবং তাহাকে,গল্পত্বকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে ...লেখার প্রেরণা যখন ঘটনাপ্রবাহের নিকট যাওয়া আসা করে তখনই গল্পের বহুত্বের অনুভব হয়।''

'গল্পের বস্তুত্ব', 'লেখার প্রেরণা' এবং 'ঘটনাপ্রবাহ' এই তিনটির সম্পর্কের মধ্যেই কমলকুমারের গল্পের ধারণাটি পূর্ণরূপে ধরা আছে। প্রথমত: 'গল্পের বস্তুত্ব' কথাটির প্রসঙ্গে ভাস্কর্যের প্রসঙ্গ এসে যায়। যেভাবে একজন ভাস্কর সৃষ্টি কালে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যম তথা বস্তুকেই বারবার আঘাত করে রূপের বস্তুত্বের অর্থাৎ তাঁর অবজেকট গড়ে তোলেন। কমলকুমারও তেমনি আক্রমণ করেন ভাষা ও প্লটকে। মার্সেল প্রুস্তের অনুসরণে তিনি বিশ্বাস করেন ভাষাকে যে আক্রমণ করে সেই ভাষাকে বাঁচায়। এই আক্রমণ কেবল ভাষার উপরেই নয়, প্লটের ওপরও চালিয়ে যান কমল কুমার। তাই তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসেই গল্প বলতে যা বোঝায় তার ধারাবাহিকতা থাকে না। 'ফ্রেম' বদলে যায়।

দ্বিতীয়ত:, 'লেখার প্রেরণা' তথা লেখকের মানসিক গড়ন প্রবণতাটি সক্রিয় থাকে বলে কমল কুমারের রচনায় কাহিনীর চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় 'থীম'। 'থীম'কে যথার্থ রূপ দিতে তিনি শিল্পের যাবতীয় সূক্ষ্মতাকে সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করেন।

তৃতীয়ত:, 'ঘটনাপ্রবাহ'। পাঠক - সাধারণ ঘটনাপ্রবাহকেই গল্প মনে করতে অভ্যস্ত। কারণ ঘটনাপ্রধান গল্পই বাংলা সাহিত্যে বেশি প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি', 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রভৃতি 'ঘটনাগৌণ' গল্প শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে চিহ্নিত হলেও পাঠক-সাধারণ তেমনভাবে সে ধারাকে গ্রহণ করেনি। কমলকুমার 'ঘটনাগৌণ' ধারাটিকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

কমলকুমারের সাহিত্যলক্ষণ বিষয় নির্বাচন করে গল্প রচনা নয়, 'থীম' অবলম্বনে সাহিত্য গড়ে তোলা নিজস্ব কলাকৌশলে। ফলে কোন বিষয় তিনি গ্রহণ করেছেন, তার চেয়েও বেশি করে দেখতে হয় কোন থীমকে অবলম্বন করে তিনি রচনার শিল্পশরীর গড়ে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির থীম বিচার করলে দেখা যাবে তা দুধরনের ১) মানুষের অস্তিত্বের অন্বেষণ ২) মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্বেষণ। প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পড়ে — অন্তর্জলী যাত্রা, পিঞ্জরে বসিয়া শুক, গোলাপসুন্দরী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে 'অনিলা স্মরণে'। 'সুহাসিনীর পমেটম' এ দুটি ধারারই মিশ্রণ ঘটেছে।

কমলকুমারের রচনায় 'গল্পগৌণতা'র দিকে যাত্রা ঘটেছে অন্তর্জলী যাত্রাতেই। উপন্যাসটির কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত : বৃদ্ধ সীতারাম চট্টোপাধ্যায়কে অন্তর্জলীর জন্য গঙ্গার ঘাটে নিয়ে আসা হয়েছে। কুলীন বৃদ্ধটির সঙ্গে ষোড়শী যশোবতীর বিয়ে হয় শ্মশানঘাটেই। বৃদ্ধ মারা গেলে যশোবতীকে সতী হিসেবে দাহ করার প্রস্তুতি চলে। চণ্ডালবৈজু তাকে নানাভাবে বাঁচাতে চেষ্টা করে। ধর্মীয়-সংস্কারে যশোবতী স্বামী ছাড়া বেঁচে থাকাকে গুরুত্ব দেয় না। শেষে একদিন ভরা কোটালে পূর্ণিমায় বৈজ, যশোবতী, সীতারাম গঙ্গায় ভেসে যায় — এই সামান্য ঘটনার সাহায্যে লেখক উপন্যাস রচনা করেন নানা বর্ণময় চিত্র, বিপরীত মেরুর কিছু চরিত্র এবং পরিবেশের সংঘাতকে অবলম্বন করে।

এই কাহিনী নিছক বাইরের । মানুষের অস্তিত্বের কথাই লেখক বলতে চান, তাই উপন্যাসটির আধেয় বিষয় মৃত্যু আর জীবন। বৈজু নয়, যশোবতী, সীতারামও নয়। লেখক থীমটাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসে থীম অনেকখানি প্রাধান্য পেলেও এতে চরিত্রও গুরুত্ব পেয়েছে, সীমিত অর্থে চেতনা-প্রবাহ ও কাজ করেছে। কমলকুমারের রচনায় ঘটনার গুরুত্ব কম বলে লেখক কাহিনীর শুরুতেই 'সাসপেন্স' ভেঙে দেন। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র প্রথমেই বলে দিয়েছেন সীতারাম দোসর নিয়ে পূর্ণিমায় মারা যাবে। 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' উপন্যাসেও কয়েকপৃষ্ঠার মধ্যেই জানিয়েছেন, সুঘরাই তার প্রিয় পোষাপাখিকে হত্যা করবে। বাকিটা যেন পাখিটিকে মেরে ফেলার প্রস্তুতির গল্প। 'খেলার প্রতিভা'য় সেই অর্থে কোনও গল্পই নেই। এতে আছে বর্ণনার পর বর্ণনা, কোনও কেন্দ্রের টান নেই। অথচ 'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসে গল্পের সাসপেন্সকে ধরে রেখেছেন শেষপর্যন্ত। 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' উপন্যাসে থীমটিকে রূপ দিতে ন্যূনতম গল্পকে গ্রহণ করেছেন লেখক। যে কারণে যেটুকু গল্প বর্তমান বলে মনে হয়, সেটাকেও তিনি ভেঙে দিয়েছেন সচেতনভাবে। কালগতভাবেও (time) এগিয়ে - পিছিয়ে গল্পের ধারাবাহিকতাকে নষ্ট করেছেন।

'গোলাপ সুন্দরী' স্পষ্ট দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে অসুস্থ বিলাসের স্যানেটোরিয়াম জীবন এবং দ্বিতীয় পর্যায় সুস্থ বিলাসের পুনরায় অসুস্থ হওয়া। এই দুটি পর্যায়কে লেখক ব্যঞ্জিত করেছেন দুটি প্রতীকের সাহায্যে। প্রথম পর্যায়ে 'বুদবুদ' এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 'গোলাপ' জীবনের অনিত্যতাকে প্রকাশ করে। গল্পের কোন টেনশনে সে ক্রমে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নেয় তার ইঙ্গিত নেই। ফলে কাহিনীর দুটি পর্যায় পরস্পর সম্পৃক্তভাবে মেলে নি। 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের এটি বড় দুটি।

কমলকুমারের প্রথম পর্বের গল্পে কাহিনীভাগ বা ঘটনাপ্রবাহ যথোচিত গুরুত্ব পেলেও উত্তরপর্বে গল্পের লক্ষনীয় পরিবর্তন ঘটেছে ভাষায় ও রীতিতে। গল্পের কাহিনীগত কাঠামো বর্জন করে কেবল থীমকেই গল্প করে তুলেছেন। 'লুপ্ত পূজাবিধি' গল্পে একটি প্রদর্শনীকে সামনে রেখে তিনি ঘটনাগত বিষয়কে গ্রহণ না করে গুরুত্ব দিয়েছেন হিন্দুদের শ্রেণী অবস্থানগত বৈষম্যের ভাবনাকে ।

উত্তরপর্বের গল্পে কাহিনীকে বাদ দিয়ে থীমকে প্রাধান্য দেওয়ায় রচনাগতভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন, প্রসঙ্গের ভেতর অন্য প্রসঙ্গ,রূপচিত্রময়তার বদলে বিবরণ। সেই বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে টীকা-টিপ্পনী, ব্যাখ্যা, এমনকী দার্শনিক ধরনের মন্তব্য। থীমকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রসঙ্গের শাখা-প্রশাখাই হল মূল গল্পের গঠন। গল্পের উপমাগুলিও রূপময়তা থেকে পরিবর্তিত হল ভাবময়তায়। উপমার ব্যবহারও কার্যত কমে গেল, তার স্থানে এল বর্ণনা। আগে এমন উপমা দিতেন ''ঘোড়াটির ঘাড় যেমন বা মাছ পড়া ছিপ''(কয়েদখানা)। উত্তরপর্বের উপমা হল - ''অসম্ভব নির্জনতা গোঁয়ার হইতে লাগিল।'' (স্বাতী নক্ষত্রে জল)। অপ্রত্যক্ষের অনুভবে অভ্যস্ত নাহলে এ জাতীয় উপমা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

'শ্যাম-নৌকা' গল্পটির নির্মাণ কিছু দূর্বল। কালাচাঁদ ঠিক বাস্তব চরিত্র হয়নি, তাকে দার্শনিকও বলা যায় না। কমলকুমার গল্পটিকে ত্রুটিপূর্ণ দেখেছিলেন বলে এটিকে পরবর্তীকালে উপন্যাসে রূপ দেন।

তাঁর 'বাগান' সিরিজের একাধিক গল্পে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও 'বাগান কেয়ারি' একটি নিটোল গল্প। শেষ পর্যায়ের গল্পে কমলকুমার কাহিনীকে কার্যত বর্জন করেছিলেন, তবে এই গল্পটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

'রুক্মিনীকুমার' মূলত গল্পের আদলে উপন্যাস। প্রচলিত গল্পের তুলনায় এর চরিত্র সংখ্যাও বেশি, ঘটনাক্রম বেশ বিস্তৃত।

ষষ্ঠ অধ্যায় : চরিত্র বিশ্লেষণ :

হেনরি জেমস তাঁর 'দ্য আর্ট অব ফিকশন' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, জীবনের কাহিনীকে নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে গেলে চরিত্রের মাধ্যম ছাড়া আর কী-ই বা আছে? আর কাহিনী বলতে চরিত্রের বিকাশ ছাড়া আর কী বোঝাতে পারে? যে কোনও উপন্যাসই চরিত্র সৃষ্টির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

কথাসাহিত্যের চরিত্র যুগের অভিঘাতে একাধিক বৃত্তির সংঘাত-সমন্বয়ে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি চরিত্রকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। ফলে শ্রেণীগত পরিচয় অপেক্ষা ব্যক্তি পরিচয় প্রধান হয়ে উঠেছে। কথাসাহিত্যে জটিল মানবমনের অন্ধকার দূর করার প্রয়াস নতুন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছে।

শ্রেণী-বিভাজন করার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন থেকেও এবং পরস্পর মিশ্রণের উদাহরণ মনে রেখেও সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষায় চরিত্রকে মূলত দুভাগে ভাগ করা হয়। নির্বিশেষ চরিত্র (Type) আর ব্যক্তি (Individual) চরিত্র। নির্বিশেষ চরিত্র একমাত্রিক, ভাল মন্দের বিচার সেখানে সহজ। তবে কথাসাহিত্যে একরঙা চরিত্রের গুরুত্ব কম নয়। মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনীতে যে ধরনের চরিত্র স্থান পায়, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য একাধিক বৃত্তির সংঘাত। তাদের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনা ও শক্তি থাকে, প্রথাগত মূল্যবোধের পরিবর্তে তারা ব্যক্তিগত মূল্যবোধে চালিত। এমন সজীব ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রকে বৃত্তাকার চরিত্রও (Round character) বলা হয়।

শিক্ষিত নগরবাসী থেকে শুরু করে গ্রামীণ, এমন কী আরণ্যক - অন্ত্যজ মানুষের অজস্র চরিত্র চিত্রিত করেছেন কমলকুমার তাঁর গল্প-উপন্যাসে। অতীতের ধর্মভীরু সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু (অন্তর্জলী যাত্রা, শ্যাম-নৌকা), শহুরে -অভিজাত শিক্ষিত ('গোলাপ সুন্দরী'র বিলাস), প্রান্তিক চাষি ('খেলার প্রতিভা, তেইশ, জল), আদিবাসী (শবর শবরী, পিঞ্জরে বসিয়া শুক) ইত্যাদি বহুবিচিত্র চরিত্রের উপস্থিতিতে তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি যেন এক অফুরন্ত চরিত্র চিত্রশালা। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির কথাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উপন্যাসে নারীর ভূমিকা সচরাচর গৌণ। তুলনামূলকভাবে 'গোলাপ সুন্দরী'তে নারীর অবস্থান ব্যাপক। তাঁর পুরুষেরা অন্তর্জলী যাত্রা'র চণ্ডাল বৈজুর মতো কাম কাতর। আদিম মানুষের জৈবিকতায় তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন উপন্যাসের অনেক চরিত্রই অবিকশিত। তাঁর সৃষ্ট অনেক চরিত্রই নির্বিশেষ ধরনের, সকলের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি। 'খেলার প্রতিভা'য় একের পর এক চরিত্র এনেছেন লেখক। কোনও নির্দিষ্ট চরিত্রেরই বিকাশ ঘটেনি সেখানে। সব চরিত্রই কখনো গৌণ, কখনো মুখ্য। তথাপি তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা মূলত জীবনমুখী। তারা একই সঙ্গে জৈববৃত্তিতে পরিপূর্ণ বাইরের মানুষ, আবার মরমী অস্তিত্বে চিরন্তন মানুষ। তাঁর অনেক রচনার মুখ্য চরিত্র কিশোর বা কিশোরী। নানা ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করলেও কমলকুমার মূলত ব্রাত্য জীবনের কথাকার। চিত্রময়তার প্রাচুর্য তাঁর রচনায় চরিত্র-চিত্রণের সহায়ক না হয়ে কিছু ক্ষেত্রে পরিপন্থী হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, কমলকুমার, কলকাতা : পিছুটানের ইতিহাস

২. লাহিড়ী, অনিরুদ্ধ, তত্ত্বতালাশ : কয়েকটি পঠন

সপ্তম অধ্যায় : গদ্যশৈলী :

সাহিত্য সৃজনে বিষয়বস্তুর পাশাপাশি রচনা-রীতিও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক, এ কথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন কমলকুমার। গদ্যরীতিই লেখক হিসেবে তাঁকে গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে পাঠকের কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। নিজস্ব ভাষাশৈলী নির্মাণে তাঁর পারদর্শিতা যেমন অনেক পাঠককে আগ্রহী করেছে, তেমনি অনেককে বিমুখও করেছে। এ কারণেই তাঁর ভাষা প্রবল বিতর্ক জাগায়।

১৯৩৭-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'লালজুতো'র গদ্যরীতিতে তিনি ছিলেন সহজ, স্বাভাবিক। তিনি যে সাবলীল চলিত ভাষায় লিখতে পারতেন, তার অনেক নিদর্শন আছে। পত্রিকায় শিল্প-সমালোচনা এবং নানা বিষয়ে নিবন্ধ লিখেছেন স্বাভাবিক চলিত ভাষায়। তাঁর বয়সী অনেক লেখকই সাধু বাংলা চিরতরে ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন চলিত ভাষায়, প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কমলকুমার বিপরীত যাত্রা করে সাহিত্যরচনায় সাধুবাংলাকে গ্রহণ করেছেন। কবিত্বময় অথচ ঋজু তার গদ্যরীতি রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্র থেকে একেবারে ভিন্ন স্বাদের।

১৯৪৫-৪৬ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত 'গল্প জল' তেইশ ও 'মল্লিকা বাহার' এ তাঁর ভাষা নিরীক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'শবরী মঙ্গল' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এর ভাষা চলিত এবং তাঁর চিত্রময় গদ্যের প্রাথমিক অনুশীলনের স্তরের। পরবর্তীতে তাঁর ভাষার শব্দ - ব্যবহার এবং বাক্যগঠনরীতি এমন নিয়মে চলে যা সাহিত্য পাঠকের অজানা। এমন নয় যে তিনি একটি বিশেষ সাহিত্যকর্ম রচনার জন্যই এমন ভাষা সাময়িকভাবে তৈরি করে নিয়েছেন (যেমন করেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার 'ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড' এর ক্ষেত্রে)। বস্তুত, তিনি তাঁর পরিণত বয়সের যাবতীয় সাহিত্যকর্মেই 'নিজস্ব গদ্যরীতি' প্রয়োগ করেছেন। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র গদ্যই তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' এর গদ্যরীতি অপেক্ষাকৃত জটিল। 'লালজুতো'র কমলকুমার আঠাশ বছর ধরে শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হতে হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষায় লিখিত 'সুহাসিনীর পমেটম' এ পৌঁছান।

'সে আপনকার' দিয়ে যে বাক্যটি শুরু হয়েছে পূর্ণদৈর্ঘ্যের উপন্যাস 'সুহাসিনীর পমেটম' এ সেটি বিরামচিহ্ন হিসেবে ড্যাশ, হাইফেন, সেমিকোলন, কমা, ব্র্যাকেট, উদ্ধারচিহ্ন প্রভৃতি গ্রহণ করলেও একটি পূর্ণচ্ছেদে পৌঁছায় উপন্যাসটির অন্তিম শব্দ 'সুন্দর' এর শেষে। কারণ ছোট ছোট বাক্যগুলি তিনি জুড়ে দিয়েছেন অসমাপিকা ক্রিয়ায়। এভাবে কার্যত বাক্য বলে কিছুই থাকেনি, পাতার পর পাতা পূর্ণচ্ছেদহীন ঠাসা রচনা।

যেখানে গল্পের বা উপন্যাসের বিষয় গ্রামীণ লুপ্ত-আদিম সমাজের সেখানেই তিনি ভাষার আদিম রূপটিকে গ্রহণ করেছেন। 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' এর ভাষা তার উদাহরণ। লেখার অভিপ্রায়

ও ভাষারীতির বৈশিষ্ট্যটি এভাবেই তিনি মেলাতে চেয়েছেন। তাঁর গদ্যরীতির জটিলতার কারণগুলি হল —

১. ভাষার বর্ণনাত্মকতার সঙ্গে নানা শিল্পমাধ্যমের অনুষঙ্গ ও সূক্ষ্মতা আরোপে ভাষাকে রূপাত্মক করে তোলা।

২.ব্যাকরণের নিয়মশৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করে শব্দকে অনভ্যস্ত স্থানে বসিয়ে শব্দের উপর বহুতর মাত্রারোপ।

৩. ব্যক্তি মানুষকে তার পরিবেশসহ বৃহত্তর প্রেক্ষিতে আঁকতে চাওয়ার ভাষাকে সেই বৃহত্তর অনুষঙ্গে ক্লাসিকধর্মী করে তোলা।

৪. দীর্ঘবাক্য গঠন।

সূত্র নির্দেশ

১. রক্ষিত, বীরেন্দ্রনাথ, কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার, পৃ.১৪৮

২. রায়, দেবেশ, সময়-সমকাল, পৃ. ৮৭

৩. কায়সার, রফিক, কমলপুরাণ, পৃ. ৯

অষ্টম অধ্যায় : কমলকুমারের সাহিত্যে ধর্ম ও অধ্যাত্ম ভাবনা :

'সাহিত্য বলিতেই আমি ধর্মজ্ঞান বুঝি,' এর পাশাপাশি সমকালীন সমাজ-মানসিকতাও তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আমাদের সুধীসমাজ ধর্ম কথাটা শুনিলে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়েন এবং মনুষ্যধর্ম ভুলিয়া যান ... ধর্মের বোধের মধ্যে কোন রসের সন্ধান পান না।' সমকালীন লেখকদের মতো তিনি কোনো রাজনৈতিক দর্শনে আশ্রয় খুঁজে পাননি, তাঁর আকাঙ্ক্ষার জগৎ ভিন্নতর ছিল। কমলকুমারের পরিণত বয়সের বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের সূচনাতে আরাধ্য দেবদেবী এবং গুরুপ্রতিম রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে। ভক্ত-হৃদয়ের আর্তি, অসহায় আত্মসমর্পণও সেখানে গোপন করা হয়নি। তেমন একটি দৃষ্টান্ত 'রাধে মাধবায় নমঃ তারা তারা জয় রামকৃষ্ণ! মাগো আমাদের আর কেহ নাই জানিও।' (ভাবপ্রকাশ বিষয়ে)

উল্লেখ করা প্রয়োজন, কমলকুমারের অপরিণত রচনাই শুধু নয়, পরিণত বয়সের বিখ্যাত গল্পগুলির (নিম অন্নপূর্ণা, তাহাদের কথা, মতিলাল পাদরী) সূচনাতেও ধর্মীয় সম্বোধন নেই। মধ্যবয়সে এর সূত্রপাত করার পর, সব ধরনের লেখাতেই তা মেনে চলেছেন। বস্তুত, ধর্ম-জিজ্ঞাসার উন্মেষ তাঁর জীবনে ঠিক কোন সময়ে ঘটেছে, তা বলার মতো উপযুক্ত তথ্যের অভাব রয়েছে। বিয়ের পর কমলকুমার বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেইসঙ্গে উল্লেখ্য, শৈশবের কিছু ধর্মীয় স্মৃতি তাঁর মনের গভীরে সুপ্ত হয়েছিল। সম্ভবত রামকৃষ্ণ ভাবধারার সংস্পর্শে আসার পর থেকে তিনি ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কমলকুমার তাঁর পছন্দের বাংলা বইয়ের যে তালিকা দিয়েছেন, তার অর্ধেক ধর্ম-সম্পর্কিত।

শান্ত ঈশ্বর উপলব্ধির চেয়ে ভক্তির পথকেই কমলকুমার গ্রহণীয় মনে করতেন। ''ভক্তি হইতেছে ব্যবহারিক জীবনের যেমন বাস্তব, তেমনই সাধনমার্গে তাহার মূল্য হেয় নয়।'' তাই হিন্দুধর্ম সাধনার জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ নয়, ভক্তি মার্গের পথিক তিনি।

চৈতন্য, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের উল্লেখ কমলকুমারের রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে অনেকবার হয়েছে। বিশেষ করে রামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তির কেন্দ্রে ছিলেন। এঁদের ধর্ম ও অধ্যাত্ম ভাবনা কমলকুমারের ভিতরে ক্ষেত্রে বীজ বপনের কাজ করেছে যা তাঁর স্বকীয় পোষণে পুষ্ট ও বিকশিত হয়েছে। তিনি হিন্দুধর্মের তিন প্রধান শাখার মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের প্রতিই আসক্তি প্রকাশ করেছেন। শৈবধর্মের প্রতি তাঁর আসক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণের মতো কমলকুমারও ব্রাহ্ম-ধর্মকে পছন্দ করতেন না। ঘনিষ্ঠদের স্মৃতিচারণায় যেমন তার ব্রাহ্ম-বিরূপতার অনেক উল্লেখ মেলে, লেখাতেও তিনি সরাসরি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

কমলকুমারের ধর্মচিন্তার তথ্যগত ও তাত্ত্বিক আলোচনার রাজ্য ছেড়ে এবার প্রবেশ করা যাক গল্প - উপন্যাসের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে, যেখানে তাঁর ধর্মভাবনা জীবন্ত চিন্তায় ব্যাপৃত। কমলকুমার

'অন্তর্জলী যাত্রা'র ভূমিকায় বলেছেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন, এস গল্প সেই গল্প, ঈশ্বরদর্শন যাত্রার গল্প'।

রামকৃষ্ণ দেহকে অবজ্ঞা করলেও — উপন্যাসের নায়ক দেহকে খুব ভালবাসে। কারণ তার কাছে শরীর মায়া নয়। রামকৃষ্ণ বলেছেন, ''ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা।' বস্তুত, জগৎ যদি মিথ্যা হত, তাহলে সতীদাহের সম্ভাবনায় বৈজু অস্থির হত না। তাই 'অন্তর্জলী যাত্রা' যে ঈশ্বর দর্শনের গল্প, আসলে মানুষই সে ঈশ্বর। তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'সঠিকভাবে এই জগতের কথা লিখিতে পারিলে তাহার কথাই লেখা হইল, কেননা সমস্ত কিছুতেই তিনি আছেন'। সাহিত্য বলতে কমলকুমার ধর্মজ্ঞান বুঝতেন যা 'মানুষের প্রতি অবিচল ভক্তি দিয়া থাকে।' সেই ভক্তি দিয়েই বৈজু চরিত্রের নির্মাণ। তিনি ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী, যেখানে মনুষ্যত্ব, মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান।

'শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি' শ্মশানের প্রেক্ষিতেই সাধক রামপ্রসাদের গানের আবেদন পূর্ণতা পায়। সেই পটভূমিতে রচিত উপন্যাসটিতে রামপ্রসাদী গায় বৈজু, যশোবতীর ও মনে পড়ে রামপ্রসাদী গান। লেখক রামকৃষ্ণ-রামপ্রসাদের প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশ করলেও ধর্মীয় শোষণের নানারূপ ফুটে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসে। ব্রাহ্মণের অর্থলিপ্সা তার অন্যতম।

লেখক উপন্যাসের কোথাও সরাসরি সতীপ্রথার নিন্দা প্রশংসা করেন নি। তবে চণ্ডাল বৈজুকে নায়ক করাতেই স্পষ্ট হয় সতীপ্রথাকে গৌরব দান করা, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। বর্ণ হিন্দুর সে কালীন মানসিকতাকে বৈজু চরম আঘাত করে।

'অন্তর্জলী যাত্রা'র মূল বিষয় সতীদাহ। কন্যাকে সতী হতে হবে জ্যোতিষীর মুখ থেকে তা জানবার পর পিতা সাময়িকভাবে অপত্য স্নেহে কষ্ট পেয়েছিল। তবে সেও ধর্মীয় প্রথার পিঞ্জরে বন্দী। পূণ্যলোভী পিতা কন্যাকে বোঝায়, তারজন্য পরিবারের সকলের স্বর্গলাভ হবে। লেখক দেখিয়েছেন, পিতা, জ্যোতিষী পুরোহিত - সতীদাহে সবাই নিজেদের মতো করে লাভবান হতে চায়। চণ্ডাল বৈজু একাই ধর্মীয় নি ঠুরতার প্রতিবাদ করে।

কমলকুমারকে দেখা গিয়েছে বর্ণহিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে, আচার-অনুষ্ঠান আর সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে । 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বক্তব্য ও ভাববস্তু তাঁর এ ধরনের মানসিকতাকে সমর্থন করে না। উপন্যাসটি যেন লেখকের শ্রেণীগত সহানুভূতি ও ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসটিতে ধর্মীয় শোষণ, নিষ্ঠুরতার প্রবল সমালোচনা করা হয়েছে। ফলে পাঠকের মনে হতে পারে, তিনি এক স্ববিরোধিতার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বস্তুত, লেখকের ঘোষিত বিশ্বাস তার রচনায় নিহিত দৃষ্টির মধ্যে অনেকসময় বিরোধ ঘটে যায়। ফলে লেখকের মতাদর্শকে হারিয়ে দেয় রচনার নিহিত বাস্তবতাবোধ। লেখক সমাজ-বাস্তবতার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে না পারায় মতবাদের আকর্ষণ খসে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করে প্রকৃত সত্য। এমনই ঘটেছে তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে।

'অন্তর্জলী যাত্রা'তেও বর্ণহিন্দুর জীবনাদর্শ লেখকের বাস্তবতাবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারে

নি। ভাবাদর্শের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কমলকুমারের সমাজ-বাস্তবতা বিশ্লেষণে তাই আচ্ছন্নতা নেই। কমলকুমার ধর্মের খাঁচায় বন্দী মানুষের বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' উপন্যাসে। নিম্নবর্ণের ডোম সুখরাই উচ্চবর্ণের মনিবের গৃহভৃত্য। তীর্থস্থানে এসে সে দেবী-দর্শনের আকাঙক্ষায় ব্যাকুল হয়। তবে দেবী-দর্শনে সে ব্যর্থ হয়, কারণ দেবী উচ্চবর্ণের অধিকারে। সমাজ থেকে প্রাপ্ত ঘৃণাকে যে ভুলতে চায় তার পাখিকে অবলম্বন করে।

সুখরাইকে শূদ্র জন্মের গ্লানি থেকে মুক্ত করতে চান উদার- হৃদয়, ধর্মভীরু মনিব দম্পতি। তাঁদের মানবতার ধারণা গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ - বাণীর আশ্রয়ে। তবে তাঁদের ব্যক্তিগত উদারতা সমাজে প্রভাব ফেলে না। বর্ণপ্রথার যন্ত্রণাকে বুকে নিয়েই সুখরাই তার দুঃস্বপ্নের জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। পদদলিত শূদ্রের জীবনের সান্ত্বনা কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ। মৃত্যুর পর উচ্চবংশে পুনর্জন্মের স্বপ্ন এদের বাঁচিয়ে রাখে।

ব্রাত্য জীবনের অপূর্ণতা ও অবসাদের ছবি তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প উপন্যাসে মর্মস্পর্শী করে এঁকেছেন। কারণ বর্ণপ্রথা ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাত্যজনের জীবন বিকাশের প্রতিবন্ধক। কমলকুমার বর্ণভেদের অমানবিক রূপ তাঁর সাহিত্যে বারে বারে ফুটিয়ে তুলে এই ব্যবস্থার বিলুপ্তিই চেয়েছেন।

হিন্দুধর্মের প্রথা যেখানে অমানবিক, নিষ্ঠুর - কমলকুমার সেখানে তার সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। মানবিকতার প্রশ্নে তিনি শেষপর্যন্ত ধর্ম ও জাতিভেদকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মানবিকতা হিন্দুধর্মের অনুশাসনের নয়, জীবনের জয় ঘোষণা করেছে।

'অনিলা স্মরণে' উপন্যাসের কিশোরী নায়িকা 'অনিলা মধুর স্বভাবা, ভক্তিমতী' তার কারণ 'ঐশ্বরিক গুণে সে হয় পবিত্র'। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আর প্রয়াত পিতার প্রতি প্রেমভক্তি তার কাছে একাকার।

কমলকুমারের ধর্মভাবনা বুঝবার ক্ষেত্রে 'মতিলাল পাদরী' গল্পটি গুরুত্বপূর্ণ। পাপীকে ক্ষমা করার অঙ্গীকার পালন করে মতিলাল ধর্মকে তার যথার্থ মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃত ধার্মিক মতিলাল নিম্নবর্ণের মানুষ, তিনি হিন্দুও নন।

সুহাসিনীর পশ্চিম উপন্যাসের দেশীয় খ্রীষ্টান চরিত্র যোহন একাদশীর প্রতিও লেখকের গভীর সহানুভূতি পাঠকের এড়ায় না। কারণ যোহনের ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষায় কোনও খাদ নেই।

অন্যদিকে 'তেইশ' গল্পের নায়ক গরীব চাষী আলম, 'জগদীশ্বরে মতি রাখে'। 'কয়েদখানা'র নায়ক শাজাদ পীরের থানে শ্রদ্ধা জানাতে ভোলে না। জল গল্পের মুখ্য চরিত্র ফজল সৎমানুষ, পরিস্থিতির চাপে তাকে ডাকাতি করতে হয়। তাই পাপবোধ তার পিছু ছাড়েনি। এই তিন মুসলমান চরিত্রকে গল্পের নায়ক করে কমলকুমার ধর্ম বিষয়ে তাঁর মনের উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।

মতিলাল পাদরী, যোহন একাদশী, আলম, শাজাদ, ফজল প্রভৃতি চরিত্র সাক্ষ্য দেয়, বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির যতই জয়গান করুন, কমলকুমারের ধর্মভাবনা সেখানেই সীমিত থাকে নি।

তিনি জেনেছেন, হিন্দুধর্মই একমাত্র শ্রদ্ধাযোগ্য ধর্ম নয়। নিজের আচরিত ধর্ম বলেই বোধহয় হিন্দুধর্মের কুরীতির তিনি সমালোচনা করেছেন, খ্রীষ্ট বা ইসলাম ধর্মের কোনও সমালোচনা করেন নি ।

ভক্তিরসে সিঞ্চিত করে তিনি তাঁর সাহিত্যকৃতি পরিবেশন করেন নি। সেখানে অতীন্দ্রিয় ভাবপ্রবণতার আচ্ছন্নতা নেই। তাঁর সাহিত্য মোটেই আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ নয়। ভক্তির তলায় সেখানে মানবতা, সমান-বাস্তবতা চাপা পড়ে যায় নি। কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের লেখক তাঁর গুরুপ্রতিম রামকৃষ্ণের সামনে নতজানু করান নি।

সূত্রনির্দেশ :

১. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, নীতি, যুক্তি ও ধর্ম, পৃ. ১৪৩-১৪৪
২. ত্রিপাঠী, অমলেশ, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, পৃ.৪৩
৩. শ্রীম, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, পৃ.৩২,৫০
৪. সরকার, সুমিত, কলিযুগ, চাকরি, ভক্তি : রামকৃষ্ণ ও তাঁর সময়, পৃ.৭৯
৫. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ. ৩২-৩৩
৬. সেন, ক্ষিতিমোহন, হিন্দুধর্ম, পৃ. ২২
৭. সিকদার, অশ্রুকুমার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, পৃ.১১৭-১৪৮
৮. কমলকুমার মজুমদার, প্রবন্ধ সংগ্রহ, পৃ.১২৯, ১৭৯, ১৮৫, ২৫২, ৩৪২
৯. দাশগুপ্ত, অশীন, প্রবন্ধ সংগ্রহ, পৃ. ১৪৭

নবম অধ্যায়: অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্য কর্মের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা:

সমকালীন আরেক ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে কমলকুমারের সাহিত্যের সাদৃশ্যর কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। কথাশিল্পী দিব্যেন্দু পালিতের বক্তব্য, 'অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা পড়তে-পড়তে কখনো কখনো আর এক মজুমদার কমলকুমারের কথা মনে পড়ে যায়।' তাদের গদ্যরীতি ও সমাজ-সাহিত্য ভাবনার নিবিড় সাদৃশ্যের কথাও বলা হয়। অন্যদিকে কিছু সাহিত্যরসিক কমলকুমারকে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ একক ও বিচ্ছিন্ন এক লেখক সত্তা মনে করেন।

কথাশিল্পী হিসেবে দুজনের জীবনদৃষ্টি, শিল্প পারদর্শিতা আর সমাজ-ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যেতে পারে, এঁদের মধ্যে সাদৃশ্য কতটা। বৈসাদৃশ্যই বা ঠিক কোনখানে।

সামন্ততান্ত্রিকতা, অভিজাততন্ত্র, বংশমর্যাদা, হিন্দুয়ানি ইত্যাদি সম্পর্কে কমলকুমারের মন্তব্য অজস্র। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, দেশাচার, ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দুধর্ম ও রীতিনীতির জন্য এক ধরণের গভীর মমত্ববোধ, পিছুটান তিনি অনুভব করতেন।

অমিয়ভূষণ ও বংশমর্যাদা, অভিজাততন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অনেকটা কমলকুমারের মতাবলম্বী ছিলেন। নিজেকে তিনি বলতেন— আপাদমস্তক ফিউডাল। অমিয়ভূষণ পাবনার এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান, জাতিতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। 'গড়শ্রীখণ্ড' উপন্যাসে ব্রাহ্মণ-জমিদার সান্যাল পরিবারকে লেখক অত্যন্ত আলোকদীপ্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন। নয়নতারা-রাজনগর উপন্যাস যুগ্মকেও সামন্ততন্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি গোপন থাকেনি।

ইতিহাসবোধ: ইতিহাসমনস্কতা উভয় লেখকের মধ্যে প্রবল। কমলকুমার যেমন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' অতীতের পটভূমিতে লিখেছেন, তেমনি অমিয়ভূষণ নয়নতারা-রাজনগর, মধু সাধুখাঁ আর চাঁদ বেনে রচনা করেছেন অতীতের প্রেক্ষাপটে। এদিকে উনিশে শতকের পটভূমিতে বেশি না লিখলেও কমলকুমার সেই কালের ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। উনিশ শতকের ধর্মনেতা, সাহিত্যিকদের সপ্রশংস উল্লেখ তাঁর অনেক রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি লিখেছেন, 'যদি সত্যিই আমার গড়িবার ক্ষমতা থাকিত নিশ্চয় আশা করেন আমি ১৯ শতকে জানাইতাম। 'অন্যত্র লিখেছেন, অতীতে প্রত্যাবর্তনই আমাদের মাধুর্য্য ও সুখ দিয়া থাকে, কারণ অতীতের যাহা কিছু সত্য, যাহা কখনও নিছক বর্তমান তা নহে— যেতেতু আমাদের জীবনের সমগ্রতা তাহা বহন করে।' অত্যধিক অতীতমুখিতার জন্যই তাঁর চোখে বর্তমান যুগের লক্ষণগুলি একান্তভাবে নেতিবাচক, নঞর্থক। বলা যেতে পারে, লেখক-চেতনার রোমান্টিক ভাবনাই, এদুই সাহিত্যস্রষ্টাকে ইতিহাসের কাছে নিয়ে গিয়েছে।

রাজনীতি: রাজনীতি, বিশেষভাবে বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে কমলকুমার আর অমিয়ভূষণ অনেকবার বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়ে কমলকুমারের বক্তব্য, ''ভারতে রাজনীতি মানে পোষাকী ছ্যাঁচড়ামি।' আমি ভীষণরকম প্রতিক্রীয়শীল, প্রগতিতে বিশ্বাসী নই। 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' উপন্যাসেও লেখকের রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণা গোপন থাকেনি। অন্যদিকে অমিয়ভূষণ লিখেছেন, 'রাজনীতি উদ্বাস্তুকে তার বাস্তু ফিরিয়ে দিতে পারে না। যদি কিছু রাজনীতি করে, তা মূল্য বোধ হারিয়ে ফেলা মানুষদের নিয়ে ভোটের ব্যবসা করতে পারে।' অমিয়ভূষণ অন্যত্র

বলেছেন, ‘‘কোন রাজনৈতিক দল বা ইজমের কাছে আমার কোন দায়বদ্ধতা নেই।’ বলা যায়, রাজনীতি সম্পর্কে উভয় লেখকই একই রকম বীতশ্রদ্ধ ছিলেন।

নকশাল-আন্দোলনঃ কমলকুমারের ‘খেলার আরম্ভ’ আর কালই আততায়ী’ গল্প দুটি নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। গল্পদুটিতে আন্দোলনটির প্রতি লেখকের সহাভূতি ফুটে ওঠেনি। কমলকুমার বিপ্লবের রাজনীতিকে ঘৃণা করতেন। তিনি লিখেছেন, ‘ফরাসী বিপ্লব নামে এক বজ্জাতি ঘটিল যে কোন বিপ্লবই তাহাই।’ অমিয়ভূষণের অনেক গল্পই (সোঁদাল, পায়রারখোপ, অন্ধকার ইত্যাদি) নকশাল পটভূমিতে লেখা। গল্পগুলিতে এ বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কমলকুমার ও অমিয়ভূষণ, দু জনেই নকশালদের হত্যার রাজনীতি সমর্থন করেননি।
কলকাতা-ভাবনাঃ কলকাতার বাসিন্দা হলেও কমলকুমার কলকাতা নামের এক মানসিকতার বিরোধিতা করেছিলেন। শিল্প-সাহিত্যে কলকাতা যে আধুনিকতার জোয়ারে ভাসছিল, তিনি তাতে যোগ দেননি। আত্মপরিচয় হারানোর মূল্যে কেনা আধুনিকতা সম্পর্কে তিনি কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন। কলকাতার প্রসঙ্গ তাঁর গল্প-উপন্যাসে বেশ কম। আবার শহরটির প্রতি তাঁর মনে এক ধরণের গভীর শ্রদ্ধাও ছিল। ‘‘এই এক বিপুল শহর যাহা ধার্মিক, বহুদিন ধরিয়া আগন্তি ম্লেচ্ছ ইহার হিন্দুত্ব নষ্ট করিতে পারে নাই।’’ ‘পিঞ্জরে বসিয়া শুক’ উপন্যাসেও লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে, ‘‘ওগো পূণ্য নগরী কলিকাতা। গঙ্গাবিধৌত শ্রীশ্রী কালিমাতা আশ্রিত, ভগবান রামকৃষ্ণ পদ-ছোঁওয়া তুমি;’’।

কমলকুমার যেমন খাস কলকাতার মানুষ, অমিয়ভূষণ তা নন। ফলে কলকাতার সঙ্গে তাঁর একটা দূরত্ব ছিলই। কলকাতার সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিমণ্ডলের অনেক কিছুই অমিয়ভূষণ পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, ‘কলকাতা কী থাকার মত জায়গা?’ ‘‘...আমি জোব চার্ণকের এই শহর চাই না।’’

গঙ্গা-পদ্মাঃ কমলকুমার যে সমস্ত লেখার পটভূমি কলকাতা, সেখানে গঙ্গানদী একটি জীবনস্রোত। ‘অন্তর্জলীযাত্রা’র পটভূমি সম্পূর্ণ গঙ্গাতীরস্থ শ্মশান। তাঁর চোখে হিন্দু সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার স্রোত গঙ্গা নদী যেন একটি প্রতীক। ‘কলকাতার গঙ্গা’ নিবন্ধে তিনি সবিস্তারে প্রতীকটিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

কমলকুমারের সাহিত্যে গঙ্গার যে ভূমিকা অমিয়ভুষণের সাহিত্যে পদ্মার ভূমিকা ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাষায় ‘পদ্মা যে দেশে প্রবাহিতা সেটাই দেশ। তার বাইরে পৃথিবী আছে, দেশ নেই।’ দুজনের দৃষ্টিতে— নদী এদেশের আবহমান সভ্যতাকে ধারণ করে আছে।
ধর্ম-প্রসঙ্গঃ কমলকুমার ও অমিয়ভূষণ, উভয়ের চেতনায় ধর্মের গভীর প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁদের সাহিত্য কর্মেও বিভিন্ন ধর্মের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। দুজনেই জন্মসূত্রে পাওয়া হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কমলকুমারের মতো রামকৃষ্ণ-ভক্ত না হলেও অমিয়ভূষণ ছেলেবেলা থেকেই শিবভক্ত ছিলেন, পরিণত বয়সে বাড়িতে নিজেই দুর্গাপূজা করতেন। পারিবারে ছিল ব্রাহ্ম প্রভাব— তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেননি। তাঁর সৃষ্ট কাহিনীর অভিজাত চরিত্রের অনেকের মুখের ভাষাতেও ব্রাহ্ম প্রভাব রয়েছে। কমলকুমার অবশ্য ব্রাহ্মদের প্রতি

যথেষ্ট বিরূপ ছিলেন। তবে তিনি যেমন প্রায় সবক্ষেত্রেই কমবেশি ধর্মের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ নিয়ে আসতেন, অমিয়ভূষণ তেমন করেননি।

মৃত্যু-চেতনা: কমলকুমার মৃত্যুকে জীবনের দোসর হিসেবে দেখেছেন, ''আমাদের অস্তিত্ব মৃত্যুতে, কর্ম আমাদের ফুল ফোটার আগেই শেষ।' আমাদের সমাজে তিনি বিপুল মৃত্যু অনুভব করেছেন। 'খেলার প্রতিভা' উপন্যাসে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর পাশাপাশি মিশেছে সংস্কৃতির মৃত্যুও। তাঁর বক্তব্য, 'আমি নিজে মৃত্যুকে বড়ই ভালবাসি'...উহা বড়ই সৌন্দর্য্য!' ...মৃত্যু বাঙালি নিকট বড় আদরের'।

অমিয়ভূষণের সাহিত্যে মৃত্যু-চেতনা অনেকটাই গরহাজির। তিনি কেবলমাত্র 'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসে নায়কের মৃত্যুভয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। কমলকুমারের মৃত্যুচেতনার সঙ্গে তার প্রভেদও লক্ষ্যণীয়। অমিয়ভূষণের মতে, ''মৃত্যু-ভাবনা কেন? ...রাত তো দিনের শেষে আসবেই।...চাঁদবেনের মৃত্যু ভয় নেই। তার মতে, আমি তো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত। যেই শেষ মুহূর্ত অতীত হলো আমিও আর নেই। তাহলে মৃত্যুটা আমার হল কী করে? এখানে সবই কালে ব্যয়িত হবে।''

যৌনতা: সাহিত্যে যৌনতার ব্যবহার সম্পর্কে দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষণীয়। ভিক্টোরিয় আদলে বাঙালির যে ভাষা ও রুচি গর্হিত, যৌনগন্ধী বলা হয়েছে, কমলকুমারের সাহিত্যে সেই ভাষা ও রুচি সজীব। তাঁর অন্যতম প্রিয় বই ''শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত''র ভাষাও শুচি-বায়ূর প্রভাব মুক্ত।

কমলকুমার ও অমিয়ভূষণ, দুজনেই তাঁদের সাহিত্যে নারীর যৌনতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তুলে ধরেছেন নারী-সমকামিতার প্রসঙ্গ (যথাক্রমে 'মল্লিকা বাহার' গল্প এবং 'বিবিক্তা' উপন্যাসে)। অমিয়ভূষণ-সৃষ্ট চরিত্রের অনেকেরই জীবনের চালিকা-শক্তি যৌনতা। তাঁর বেশ কিছু চরিত্র সমাজ-নিষিদ্ধ যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত। তবু তিনি ভাষা ব্যবহারে আর যৌন-ক্রিয়ার বর্ণনায় ভিক্টোরিয় নীতিবোধে চালিত হয়েছেন। কমল কুমারের সঙ্গে এখানে তাঁর সাহিত্য ভাবনার পার্থক্য রয়েছে।

নারী ভাবনা: নারীকে কমলকুমার নিছক যৌনবস্তু ভাবতে পারেন নি। রামকৃষ্ণকে উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন 'ঈশ্বর দর্শন না হইলে রমণী যে কী বস্তু বুঝা যায় না।' অমিয়ভূষণও নারীকে কমলকুমারের মতো 'রমণী' সম্বোধন করতে পছন্দ করতেন। অমিয়ভূষণ তাঁর সাহিত্যে অনেক সময়ে নারীকে আদর্শায়িত করেছেন। কমলকুমার আর অমিয়ভূষণ, উভয়ের নারীভাবনা আজকের দিনে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে।

যাত্রা: কমলকুমারের সাহিত্য যাত্রার (Journey) লক্ষণ চিহ্নিত। সে 'অন্তর্জলী যাত্রা' হোক বা 'খেলার প্রতিভার শরণার্থীপ্রবাহ, পিঞ্জরে বসিয়া শুরু' এর যাত্রা কিংবা মানুষের সৌন্দর্যাভিসারের কাহিনী 'সুহাসিনীর পমেটম'। যাত্রা-'মোটিফ' অমিয়ভূষণের সাহিত্যের অত্যন্ত পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গে। তাঁর উপন্যাস উদ্বাস্তু, নির্বাস, চাঁদবেনে ও মধু সাধু খাঁ-সবই আদতে মানুষের স্থানান্তর যাত্রারই কাহিনী।

দেশীয়-সাহিত্যতত্ত্ব: কমলকুমারের সাহিত্য-ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব মোটেই অপাক্তেয় নয়। প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের বহুচিহ্ন ছড়িয়ে আছে অন্তর্জলী যাত্রা সহ তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে। সাহিত্য ও সাহিত্যিককে তিনি কাব্য আর কবি বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন দেশীয় ঐতিহ্য।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিবিড় অধ্যয়ন অমিয়ভূষণের সাহিত্যচিন্তা আর সৃজনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রিয় লেখক: বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, কৃষ্ণকমল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ উনিশ শতকের লেখকদের সঙ্গে কমলকুমার ভাব বিনিময় করতেন। সেকালের লেখকদের মধ্যে অমিয়ভূষণ বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের রচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিশ শতকের লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে উভয়ে পছন্দ করলেও অন্য লেখকদের ক্ষেত্রে তাদের পছন্দ তেমন মেলে না।
সাহিত্যে গণতন্ত্র: কমলকুমার ও অমিয়ভূষণ; উভয় লেখক সাহিত্যে গণতন্ত্রকে মূল্য দেননি। তাঁদের মতে উন্নতমানের শিল্প-সাহিত্য গণ-গ্রাহ্য হয় না।
বর্ণচেতনা: বাংলা সাহিত্যে শিল্প-সচেতন লেখক বেশি নেই। কমলকুমার আর অমিয়ভূষণ অল্প বয়স থেকেই ছবি আঁকতেন। স্বভাবতই তাঁদের মনে রঙের প্রতি শিল্পী-সুলভ আকর্ষণ ছিল। উভয়ের সাহিত্যকর্মে ও পরিস্ফুট হতে দেখি রঙের অন্তর্নিহিত সত্য এবং দ্বান্দ্বিক চরিত্র, সেই সঙ্গে বিশিষ্ট অনুভূতি।

গদ্যরীতি: অনেকে অমিয়ভূষণের 'ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড' আর 'মধু সাধু খাঁ' উপন্যাসের গদ্যরীতিতে কমলকুমারের প্রভাব দেখেছেন। যদিও 'ফ্রাইডে আইল্যাণ্ডের' সঙ্গে 'কমলকুমারের 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' এর গদ্যশৈলীর কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কমলকুমারের গদ্যশৈলীর বহুমাত্রিকতাকে সম্ভবত অমিয়ভূষণ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

কমলকুমার একবার সাধুরীতিতে লেখা আরম্ভ করার পর আর চলিত গদ্যে ফিরে যাননি, একথা অমিয়ভূষণের ক্ষেত্রে খাটে না।

সূত্র নির্দেশ:

১. কমলকুমার মজুমদার, প্রবন্ধ সমগ্র, পৃ. ১৫৭, ১৫৯, ১৬৯, ২৩৩, ২৬৭, ২৭৫, ২৮০
২. অমিয়ভূষণ মজুমদার, লিখনে কী ঘটে, পৃ. ২২, ২৫, ৩৫, ১০৮, ১১৩
৩. অমিয়ভূষণ মজুমদার, রচনা সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮, ৪৫, ৪১৯, ৪২৮
৪. অমিয়ভূষণ মজুমদার, রচনা সমগ্র, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯/১০
৫. পূর্ণেন্দু পত্রী, সাহিত্য-সংক্রান্ত, পৃ. ৭৫
৬. সুমিতা চক্রবর্তী, উপন্যাসের বর্ণমালা, পৃ. ১৮৮

দশম অধ্যায় : উপসংহার :

শেষ অধ্যায়ে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কথাশিল্পীদের সঙ্গে সাহিত্য-প্রতিভার তুলনামূলক বিচার করে কমলকুমারের মৌলিকতা এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কথাশিল্পীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও — কমলকুমারের গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে তাঁদের গদ্যরীতি, সমাজদৃষ্টি ও জীবনদৃষ্টির তেমন সাদৃশ্য চোখে পড়ে না। সমকালীন কথাশিল্পী বিমল কর, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনার সঙ্গেও তাঁর লেখার সাদৃশ্য নেই। কেবলমাত্র অমিয়ভূষণ মজুমদারের রচনার সঙ্গে তাঁর লেখার কিছুটা মিল রয়েছে। রচনাশৈলী, গদ্যরীতি, জীবন ও সমাজদৃষ্টি - সবদিক বিবেচনা করলে কমলকুমারকে বাংলা কথাসাহিত্যের একজন মৌলিক ভাবনার লেখক বলেই স্বীকার করতে হয়। তাঁর রচনা বাংলাসাহিত্য পাঠককে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

গুপ্ত বিপিন বিহারী, পুরাতন প্রসঙ্গ, ১৯৮৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

চক্রবর্তী, নবনীতা, বাংলা ছোটগল্পের গদ্যশৈলী, ২০০২ পুস্তক বিপণি, কলকাতা

চক্রবর্তী, রমাকান্ত , বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, ১৯৯৬, আনন্দ, কলকাতা

চক্রবর্তী সুধীর (সম্পাদক), যৌনতা ও সংস্কৃতি, ২০০২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, কলকাতা

ত্রিপাঠী অমলেশ , ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ১৯৯৯, আনন্দ, কলকাতা

দত্ত রামচন্দ্র, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ২০০৪ উদ্বোধন, কলকাতা

দাশ শিশিরকুমার , গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব, ১৯৮৫ দেজ পাবলিশিং, কলকাতা

দাশগুপ্ত অশীন, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২০০১ আনন্দ, কলকাতা

দাশগুপ্ত নরেন্দ্রনাথ, সাহিত্যবীক্ষণ, ১৯৯৭, উথ্থাক প্রকাশনী, কলকাতা

দেবসেন নবনীতা, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, ১৯৯০ করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

পত্রী পূর্ণেন্দু, সাহিত্য সংক্রান্ত, ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্রী পূর্ণেন্দু, কিছু মানুষ কিছু বই, ১৯৯৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নাথ রাখালচন্দ্র, উনিশ শতক : ভাবসংঘাত ও সমন্বয় ১৯৮৮, কে.পি.বাগচী, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ১৯৮৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ, ১৯৯৬, প: বঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায় রাঘব, লোচনদাস নামে এক কারিগর, ২০০২, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায় রাঘব কমলকুমার, কলকাতা : পিছুটানের ইতিহাস, ২০০৫, আনন্দ, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায় পার্তপ্রতিম, অন্তর্বয়নঃ কথাসাহিত্য, ১৯৯০, একুশে, কলকাতা

বসু অরুণ, (সম্পাদক), বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা, ১৯৮৭, সমতট, কলকাতা

বসু মল্লিক, শঙ্কর, ভট্টাচার্য, গৌরী, পুরাকথার স্বরূপ, ১৯৯৩ বেস্ট বুকস্, কলকাতা

ভট্টাচার্য বিষ্ণুপদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, আনন্দ, কলকাতা

ভদ্র গৌতম, চট্টোপাধ্যায় পার্থ (সম্পাদক), নিম্নবর্গের ইতিহাস, ১৯৯৮, আনন্দ, কলকাতা

মণ্ডল, প্রমথনাথ, শ্রীরামপ্রসাদ : কবি ও কাব্য, ২০০৪, সঞ্জীব প্রকাশন, কলকাতা

মজুমদার, কমলকুমার প্রবন্ধ সংগ্রহ , ২০০৯, চর্চাপদ, কলকাতা

মজুমদার, কমলকুমার অগ্রহিত কমলকুমার, ২০০৮, অবভাস, কলকাতা

মজুমদার, দয়াময়ী, আমার স্বামী কমলকুমার, ২০১০, আদম, কৃষ্ণনগর

মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, নীতি, যুক্তি ও ধর্ম, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, আনন্দ, কলকাতা

মুখোপাধ্যায়, মীণাক্ষী, উপন্যাসে অতীত : ইতিহাস ও কল্প ইতিহাস, ২০০৩, থীমা, কলকাতা

ম্যাক্সমুলার ফ্রিডরিখ, (অনুবাদ : গঙ্গোপাধ্যায়, সলিলকুমার) রামকৃষ্ণ দেব : জীবন ও বাণী, ২০০৪, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

রক্ষিত বীরেন্দ্রনাথ, কাব্য বীজ ও কমলকুমার মজুমদার, ১৯৮৫, নবার্ক কলকাতা

রায় অন্নদাশঙ্কর , বাংলার রেঁনেশাস, ১৯৯৯, বাণীশিক্ষা, কলকাতা

রায় দেবেশ, সময় সমকাল, ১৯৮০, অন্বেষণ, কলকাতা

রায় দেবেশ, উপন্যাস নিয়ে, ২০০৩ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

রায় সত্যেন্দ্রনাথ, বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

রোঁলা রোমা (অনুবাদঃ দাস, ঋষি), রামকৃষ্ণের জীবন, ১৯৪৯, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা

রুদ্র সুব্রত (সম্পাদক) কমলকুমার : রচনা ও স্মৃতি, ১৯৮২, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা

Read, Sir Herbert, English Prose style, 1998Kalyani Publishers, New Delhi.

লাহিড়ী , অনিরুদ্ধ তত্বতালাস : কয়েকটি পঠন, ২০০৫, অনুষ্টুপ, কলকাতা

লাহিড়ী,কার্তিক সৃজনের সমুদ্র-মন্থন, ১৯৮৪, অন্বেষণ, কলকাতা

শ্রী অরবিন্দ, বাংলা রচনা, ২০০৫, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী

শ্রীম , শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা

সরকার, সুধীরচন্দ্র পৌরাণিক অভিধান, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, এম.সি.সরকার, কলকাতা

সরকার সুশোভন, বাংলার রেঁনেশাঁস, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, দীপায়ন, কলকাতা

সরকার, সুমিত, কলিযুগ, চাকরি, ভক্তিঃ রামকৃষ্ণ ও তাঁর সময়, ২০০৬ সেরিবান

সরকার পবিত্র, গদ্যরীতি, পদ্যরীতি, ১৯৮০ , সাহিত্যলোক, কলকাতা

সেন, অঞ্জন, সিংহ উদয়নারায়ণ(সম্পাদক), উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, গাঙ্গেয়পত্র, কলকাতা

সেন ক্ষিতিমোহন হিন্দুধর্ম, ২০০৮, আনন্দ, কলকাতা

সেন সুকুমার, বাঙ্গলা সাহিত্য গদ্য, ১৯৯৮, আনন্দ, কলকাতা

সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া, ২০০১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

সিকদার অশ্রুকুমার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, ১৯৯৩, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

সুর অতুল, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ২০০২, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ, কলকাতা